সপ্তম অধ্যায়

কোচবিহারের শিক্ষার চালচিত্র

কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রম প্রবহমান ধারাটিকে উপলব্ধি করতে গেলে যা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হল এতদঞ্চলের শিক্ষার যথাযথ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। কেননা শিক্ষা ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। বস্তুত শিষ্ট বা নাগরিক সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারই ফল একথা বলা অসঙ্গত নয়। সুতরাং সেই নিরিখে যদি প্রাচীন কাল থেকে কোচবিহারের শিক্ষার আনুপূর্বিক ইতিহাস জানতে চাই তাহলে দেখা যায় মহারাজ নরনারায়ণের সময় রাজসভায় সভাসদ হিসাবে যোগদান করেন পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য যিনি 'প্রয়োগ রত্নমালা' নামে সহজবোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের রচয়িতা। ঠিক সেই সময়ই 'ভাগবত পুরাণ' নামে আঞ্চলিক ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করেন রাম শাস্ত্রী। লক্ষণীয় যে, শিক্ষা চেতনার যে ভিত্তিটুকুর পরিচয় আমরা এখানে পাই তা কেবলমাত্র সমাজের উর্দ্ধস্তরে কিছু আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক পুঁথি রচয়িতা নিজেকে ' গোবরাছড়া' নিবাসী বলে পরিচয় দেওয়ায় অনুমান করা অসঙ্গত নয় দিনহাটা মহকুমার গোবরাছড়া অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের কালপঞ্জী বিচারে এই ঘটনাক্রমগুলির অনুমিত সময় ১৫৫৪ সালে মহারাজ নরনারায়ণের সিংহাসন আরোহনের পর থেকে। ঐসময় পর্যন্ত রাজপুত্র নরনারায়ণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য বারাণসীতে ছিলেন। কাজেই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ঐসময় পর্যন্ত কোচবিহার বা তদানিন্তন বেহার রাজ্যে সাধারণ প্রজাদেরত দূরের কথা, এমনকি রাজপুত্রদেরও শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে মহারাজ নরনারায়ণের আমলে রাজকীয় নির্দেশে রাজ্যে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও তিনি নিজের সন্তানদের এই সব বিদ্যালয়ে পাঠান শিক্ষিত হবার জন্য। এরপরবর্তী দীর্ঘ সময় আর কোচবিহারের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়নি।(১)

বস্তুত ব্রিটিশ শক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হবার পর থেকে কোচবিহারের শিক্ষা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যলাভ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে লক্ষ্য করা যায় মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সময় পর্যন্ত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাই চালু ছিল। কিন্তু রাজ অন্তঃপুরে ফার্সী ভাষাচর্চার রেওয়াজ ছিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে ফার্সী ভাষাচর্চায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

যথাযথভাবে বলতে গেলে কোচবিহারে পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ১৮৫৭ সালে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তৎকালীন ট্রেজারী ভবনে একটি বাংলা স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানটি সদর গভর্মেন্ট হাই স্কুল নামে পরিচিত।

স্বাধীনতাপূর্ব কোচবিহারের শিক্ষাবিস্তারে এক নজরে যে ব্যক্তিদের নাম নজরে আসে তাঁরা হলেন — কর্ণেল হটন, কর্ণেল জেন্‌কিন্স, মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ, মহারানী সুনীতি দেবী, যাদব চক্রবর্তী, কালিকা দাস দত্ত, নিরুপমা দেবী, ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ঠাকুর পঞ্চানন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৮৬৪-৬৫ সালে কর্ণেল হটনের নির্দেশে গ্রামাঞ্চলে সরকারী তত্বাবধানে তিনটি বঙ্গ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। অবৈতনিক পরিদর্শক নিযুক্ত হন বাবু রামচন্দ্র ঘোষ। পরে পদটি রূপান্তরিত হয়ে Local Committee of Public Instruction নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয় শিক্ষা অধিকর্তা ও তার অধীনস্ত সহ পরিদর্শক পদ। স্থাপিত হয় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এই সময়ের কোচবিহারের বিদ্যালয় চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায় —

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় — ৩৭
অ-সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় —২১
(এর মধ্যে পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যাদের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ১৩০ জন)
সংস্কৃত টোল — ৩
মাদ্রাসা — ১

মোট — ৬২ টি

১৮৮৩-৮৪ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে স্কুল বা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ২৮৩ টি ও ধার্য মোট ব্যয় ৭৬,৪১৪ টাকা, যার মধ্যে বেসরকারী ব্যয় হল ১৮০২০ টাকা। পরবর্তী চার বছরে সরকারী অনুদানের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির ফলে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২৭ (১৮৮৭-৮৮ সালে) ও ব্যয় বেড়ে হল ৮১,১৪৪ টাকা। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে মেখলীগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা মহকুমার জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৫০০ টাকা চাঁদায় এই তিন মহকুমায় একটি করে এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকটি স্কুলের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা করে সরকারী অনুদান বরাদ্দ হয়। ১৮৮১-৮২ সালে কোচবিহারে মোট ৩৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয় ছিল ৫টি,সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ২৫৭টি এবং বেসরকারী অসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল ৬৮টি। লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল সেই সময় শিক্ষার প্রসারে সরকারী প্রচেষ্টার বাইরে রাজ্যের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের প্রচেষ্টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৮৮ সালে উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকল্পে স্থাপিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজ যা বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজ বলে পরিচিত। এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রথম কার্যভার গ্রহণ করেন মিঃ গুডলে ,এম. এ.। ১৮৯৬ সালে এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ঐ বৎসর হাতেকলমে কাজ শিক্ষার জন্য শিল্প শিক্ষা স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৯৯-১৯০০ সালে কোচবিহারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চিত্র ছিল নিম্নরূপ—

প্রকৃতি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
সরকার পরিচালিত		
মিডল ক্লাস বাংলা স্কুল	১২	৭৯৩ জন
সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুল		
আপার প্রাইমারী স্কুল	২৪	৯৭৬ জন
লোয়ার প্রাইমারী স্কুল	১৫৪	৫০৫৩ জন
নৈশ বিদ্যালয়	১৪	২৮১জন
বালিকা বিদ্যালয়	৮	১৩২জন
হায়ার ক্লাস ইংলিশ স্কুল	৯	৪১৯জন
মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কুল	৩	৩২৯ জন
মিডল ক্লাস বাংলা স্কুল	১৮	৯৩৭জন
অ-সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়		
আপার প্রাইমারী স্কুল	১	৩০জন
লোয়ার প্রাইমারী স্কুল	৬৬	১৮৯৬জন
নৈশ বিদ্যালয়	৩০	৪৪১জন
বালিকা বিদ্যালয়	৭	৬৬জন
পাঠশালা	১	১৩
মক্তব	৫	—
মোট শিক্ষায়তন	৩৫২টি	মোট ছাত্র ১১৩৩৬ জন

১৮৯৯ -১৯০০ সালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার সংলগ্ন বাংলার অন্যান্য জেলার সাথে কোচবিহারের তুলনামূলক যে শিক্ষাচিত্র পাই তা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

জেলা	মোট জনসংখ্যা	বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য পুরুষ	বিদ্যালয় পড়ুয়া	শতকরা হার
রাজশাহী	৭,১৭,৯৪৬	১,০৭,৬৯১	১৮,৪৬০	১৭.১
দিনাজপুর	৭,৭৪,৩৮০	১,১৬,১৫৭	২০,৬৩২	১৭.১
রংপুর	১০,৬১,৮১২	১,৫৯,২৭১	২০,৯৫১	১৬.৯
জলপাইগুড়ি	৩,৬৪,৬৫৯	৫৪,৬৯৪	১০,৮৪৩	১৯.৮
*কোচবিহার	৩,৯২,৪৫৭	৪৫,৩৬৮	১১,২২৬	২৪.৭

(* কোচবিহারের এই হিসাব জেন্‌কিন্স স্কুল ও তদানিন্তন ভিক্‌টোরিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হিসাবকে বাদ দিয়ে।)

উপরের সারণী থেকে এটা পরিস্কার যে, জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হিসাবে কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষা ক্রমবর্ধমান। অথচ এই তুলনামূলক শিক্ষাবৃদ্ধির পরও রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানোর বিপক্ষে প্রতিবেদন পেশ করায় ১৯০০-১৯১১ সালের মধ্যে শিক্ষায়তনের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ৩৪১টি ও ব্যয় পূর্বের তুলনায় কমে দাঁড়ায় ৫৭,৬৩৬ টাকা। উক্ত ব্যায়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় ছিল ২৬,১৩৭ টাকা ও বেসরকারী ব্যয় ছিল ৩১,৪৯৯ টাকা। লক্ষণীয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় পূর্বে প্রদত্ত শতকরা ৫০ ভাগেরও কমে নেমে যায়।

১৯৩৮-৩৯ সালে কোচবিহারে মোট স্কুল হয়েছে ৪৩৭ টি ও ছাত্রছাত্রী ১৭,৯৬৩ জন। ২৮ বছরে স্কুল বেড়েছে ১৩২টি। শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের ৪২,৮৫৫ টাকা ছিল সরকারী সূত্র থেকে আসা ও বেসরকারী সূত্র থেকে আসা টাকার পরিমান ছিল ৬৬,০৪৪ টাকা। ছাত্র পিছু তখন মোট ব্যয় হত ৬ টাকা, যার মধ্যে সরকারী সূত্র থেকে আসা টাকা ছিল মাত্র ২ টাকা, বাকি ৪টাকা আসত বেসরকারী সূত্র থেকে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কোচবিহার রাজসরকারের এই ব্যয় সংকোচন যে সমালোচক বা বুদ্ধিজীবিদের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে গেছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। উপমহাদেশের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ' রাজার রাজ্যাভিষেকে এত টাকা বাজি পুড়িয়ে, খাওয়াদাওয়ায় খরচ হল। এর এক সিকি কেন এক পাইও যদি আমার বলরামপুর স্কুলের জন্য দিত তাহলে তো ছাত্রবৃত্তি স্কুলটা আমাদের হাইস্কুল হতে পারত। আমাদের গ্রাম থেকে কতছেলে বছরে বছরে ম্যাট্রিক পাশ করত।' অথবা 'রাজার শিক্ষার জন্য তাকে বিলাত পাঠানো হল কত টাকা ব্যয় করে। আর আমাদের গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য বিলাত যাওয়ার স্টাইপেন্ড দেওয়ার কথা রাজার মনে জাগে না।' (সূত্র ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা - আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ - পৃঃ ১১৩-১১৪)

অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে রাজকীয় উদাসীনতার পাশাপাশি শিক্ষালাভের সুযোগের ক্ষেত্রে রাজা ও প্রজাদের বৈষম্য প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর। এমনকি বাংলার অন্য অঞ্চলের তুলনায় শিক্ষায়তনের সংখ্যাও অপ্রতুল বলে তাঁর মনে হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে 'বাংলার গভর্মেন্ট দেশের স্কুল কলেজগুলির সম্প্রসারণের জন্য কেমন তৎপর। আমাদের কোচবিহারে ঐ বিশালরাজ্যে চারটা মহকুমায় মাত্র চারটা হাই স্কুল আর সদরে একটা করে স্কুল ও কলেজ। রাজ্যে এনিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখিনি বা জীবনে কারুর মুখে কোন প্রতিবাদ শুনিনি।' (সূত্র ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা - আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ - পৃঃ ১১৩-১১৪)

বরং এমন ঘটনাও ঘটেছে এলাকায় শিক্ষাপ্রসারের অঙ্গ হিসাবে বেসরকারী উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত অ-অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের চার শত টাকা অভিজাত নাজির দেউ সাহেবের বংশধর টিকেন্দ্রনারায়ণ সিংহ আত্মসাৎ করে পুলিশের চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে যান। (সূত্র ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা - আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ - পৃঃ ১১৫-১১৬)

তবে পরবর্তী পর্যায়ে কোচবিহারের স্থানীয় ছেলেদের লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রিন্স ভিক্‌টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার সদর ও চারটি মহকুমার স্কুলে সব ক্লাশে পুরস্কার বিতরণের সময় নেটিভ প্রাইজের ব্যবস্থা

করেন, তাছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য ফ্রি স্টুডেন্টশিপেরও ব্যবস্থা করেন। (সূত্র ঃ আমার শিল্পী জীবনের কথা - আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ - পৃঃ ১১৭)

তবে রাজ্যের সামন্ত শাষণের অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে কোচবিহার ষ্টেট কাউন্সিল পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজ্যের ভারতভুক্তির জন্য এই পরিকল্পনা আর বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। ভারতভুক্তির সময় কোচবিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে চালচিত্র পাই তা নিম্নরূপ ঃ—

	পুরুষ	মহিলা	মোট
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪	১	১৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭২	৬	৭৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯৪	৩২	৫২৬
টোল ও মক্তব	৫	০	৫
সংস্কৃত কলেজ	১	০	১
মহাবিদ্যালয়	১	০	১
শিল্প বিদ্যালয়	১	০	১
মোট বিদ্যা প্রতিষ্ঠান	৫৮৮	৩৯	৬২৭

সামগ্রিক জনসংখ্যার শতাংশ বিচারে বিভিন্ন সময়ান্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে কোচবিহারের অগ্রগতি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

১৯০১ সালে ৫.৯ শতাংশ

১৯৩১ সালে ৬.৯ শতাংশ

১৯৬১ সালে ২১.০ শতাংশ

১৯৭১ সালে ২২.০ শতাংশ

১৯৭১ সালে প্রাপ্ত কোচবিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে চালচিত্র পাওয়া যায় তা এইরকম ঃ—

প্রতিষ্ঠান	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	------	১	৮৯৭
সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়	১৮	২	১০৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১	৭	১০৫৬৩
পূর্ণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪১	২	৩৫৭৩
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৬	৪	৪০১৩
প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১৬৯	৭	২৯০৭৬
প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২	------	৩৮
টোল ও মক্তব	১১	------	৪৯৬
শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১	------	২০০
মহাবিদ্যালয়	৫	------	------
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১	------	১৬০
পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ	১	------	------
পলিটেকনিক	১	------	------
শিল্প স্কুল	১	------	------
সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়	১	------	------
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮৫	------	৩,৮৫,২৯২

(সূত্র ঃ শিক্ষার একাল ও সেকাল — কৃষ্ণেন্দু দে— মধুপর্ণী — কোচবিহার জেলা সংখ্যা ও জেলা প্রদর্শণী স্মরণিকা — কোচবিহার -১৯৭১)

এরপর ১৯৮২ সালের শিক্ষাগত পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে যে চিত্র দেখতে পাই তা হল ঃ—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
মহাবিদ্যালয়	৫
নৈশ বিদ্যালয়	১
বালিকা বিদ্যালয়	১
শিক্ষক শিক্ষণ	১
কৃষি মহাবিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়)	১
পলিটেকনিক	১
পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২
শিল্প বিদ্যালয়	১
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮৩
উচ্চ বিদ্যালয়	১০৩
নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয়	১০৭

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৮২ সালে যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হার ছিল ৪০.৮৮ শতাংশ সেখানে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের অন্য জেলায় শিক্ষার হার ছিল কোচবিহার ২৯.৯৯ শতাংশ, দার্জিলিং ৪২.৫২ শতাংশ, মালদহ ২৩.০৬ শতাংশ, পশ্চিম দিনাজপুর ২৬.৪২ শতাংশ এবং জলপাইগুড়ি ২৯.৮৮ শতাংশ অর্থাৎ কোচবিহার ছিল উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

এরপর নব্বই-এর দশকে এসে কোচবিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যার্থি ইত্যাদির যে চিত্র আমরা পাই তা নিচে সারণীর আকারে উপস্থিত করা হল ঃ—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যা		
	১৯৯১ -৯২	১৯৯২ -৯৩	১৯৯৩ -৯৪	১৯৯১ -৯২	১৯৯২ -৯৩	১৯৯৩ -৯৪	১৯৯১ -৯২	১৯৯২ -৯৩	১৯৯৩ -৯৪
প্রাথমিক	১৭৪২	১৭২২	১৭২২	২৭০৩৪৪	২৭১৫৬৪	২৭৩০৪১	৬০৩১	৬০২৯	৬১৫৯
মধ্য	৯৪	৯৬	৯৫	১৮২৮৩	২১০৪৬	২১২২৮	৭৩৪	৭৫২	৭৫৪
মাধ্যমিক	১১২	১১০	১১১	৫৯০৪৩	৬০৪৫৬	৬১৮০৪	২০৯২	২০৪৯	২০৫৭
উচ্চ মাধ্যমিক	২৪	২৬	২৪	৩৩২৩৫	৩৩৮৯৬	৩৪১৮৯	৮৯৭	৯১৭	৯২১
মহাবিদ্যালয় (ডিগ্রী)	৮	৮	৮	১৩৪৯৯	১৪৬৯৫	১৪৮৯৮	১৯৭	১৯৭	১৯৮
পেশাগত প্রকৌশলগত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	১৫	১৫	১৫	২১৮৪	২১৯৫	২২০৩	–	–	–
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিল্প শিক্ষাগত সহ	১২৮৮	১২৮৮	১২৮৮	৫৩০৪৫	৫৩০৩৯	৫০০২৭	–	–	–

(আংশিক সময়ের হিসাব সহ)

(সূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক, কোচবিহার),

(সূত্র ঃ স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যান্ডবুক- পাবলিশড্ বাই ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এ্যান্ড্ এ্যাপ্লাইড্ ইকনমিক্স, কোচবিহার)

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহার জেলায় ৫-৭ বছর ব্যাপি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ৪০ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ দেবে ব্রিটিশ সরকার ও বাকি ২৫ শতাংশ দেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, কোচবিহার-এর সাথে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পর কোচবিহার জেলার প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া যায় তা এইরকম ঃ—

সমগ্র জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ১৭০৯টি, মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হল ৩৩২১৪৫, মোট শিক্ষক -শিক্ষিকাদের সংখ্যা হল ৫০২৭ জন, এর মধ্যে বিদ্যালয়হীন গ্রাম্য মৌজা হল ২২২ টি, পৌর ওয়ার্ড হল ১২ টি (সূত্র ঃ ডি. পি. ই. পি., কোচবিহার জেলা, তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা)। তবে প্রদত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যাটি বর্তমানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি ও অন্য বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্তির ফলে বর্তমানে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় হল ১৭০৬ টি এবং প্রতি ১ জন শিক্ষক পিছু ছাত্রসংখ্যার অনুপাত হল ৬৬.০৭ জন। (৫)

৩১/৩/৯৮ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগত চিত্র হল সদর মহকুমায় উচ্চ বিদ্যালয় হল ১০৬টি, নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ৩২ টি, দিনহাটা মহকুমায় উচ্চ বিদ্যালয় হল ২৮ টি, নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ২৬ টি, মাথাভাঙ্গা মহকুমায় উচ্চ বিদ্যালয় হল ৩১ টি, নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ১৭ টি, তুফানগঞ্জ মহকুমায় উচ্চ বিদ্যালয় ২৭ টি, নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ১৪ টি, মেখলিগঞ্জ মহকুমায় উচ্চ বিদ্যালয় হল ১৩ টি, নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ৭ টি। অর্থাৎ সারা জেলায় উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ১৯৫ টি এবং নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় হল ৯৬ টি। এই তালিকায় উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও আর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কোচবিহারে আছে সেগুলি হল ১০টি মহাবিদ্যালয়, যার মধ্যে একটি নৈশ ও একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও রয়েছে। তাছাড়া আছে পলিটেকনিক ১টি, পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১টি, শিল্প বিদ্যালয় ২টি, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২টি এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়।

কোচবিহার জেলার ১০ টি উচ্চ বিদ্যালয় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে বেশ কয়েক বছর হল। তাছাড়া আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭৫ বা ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন যাঁরা নিজস্ব কর্মক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এমন নয়, সামগ্রিকভাবে কোচবিহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বৃহত্তর বঙ্গের অঙ্গনে। তাঁদের সবার নাম তালিকায় আনা সম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

জেনকিন্স স্কুল

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (সম্পাদক, দি সার্ভেন্ট), চারুচন্দ্র দত্ত (আই. সি. এস.), কুমুদরঞ্জন চক্রবর্তী (অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ), আব্বাস উদ্দিন আহ্‌মেদ (সঙ্গীতজ্ঞ)।

মাথাভাঙ্গা হাই স্কুল

বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলী (চেয়ারম্যান, রেলওয়ে বোর্ড), রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা,

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্‌টোরিয়া) কলেজ

পুলিন দাস (বিপ্লবী), অম্বিকাচরণ রায় (অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী), সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিপ্লবী, অনুশীলন সমিতি), ডাক্তার তারকনাথ দাস (বিপ্লবী), বিষ্ণুপদ রাভা (বিপ্লবী নেতা, তেজপুর), কালিমোহন ঘোষ (শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী) , সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (সাহিত্যিক), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)।

(সূত্র ঃ কৃতি ছাত্র তালিকা ও শতবর্ষ স্মরণিকা — জেনকিন্স স্কুল, স্মরণিকা — মাথাভাঙ্গা হাই স্কুল, শতবর্ষ স্মরণিকা — আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিকটোরিয়া) কলেজ ।

লক্ষ্মণীয় যে, ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১৯৯৯ সালে কোচবিহার জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি কমে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষায়তনের এই সংখ্যা হ্রাসের পিছনে যে কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় তা হল অনেকক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয়ের কোনটিতে হয়তবা ছাত্রাধিক্য, আবার কোনটিতে হয়ত ছাত্রাল্পতার সমস্যা বিদ্যমান, অথবা কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থাকলেও নিজস্ব জমি বা ভবন না থাকায় সমস্যা সমাধানকল্পে কর্তৃপক্ষ দুটি বিদ্যালয়কে একত্র করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সঙ্গত কারণেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক শিক্ষায়তনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের প্রাপ্ত এই চিত্র কোচবিহার জেলার শিক্ষাচিত্রের অনেকটা উন্মোচন করলেও এতদঞ্চলের শিক্ষার সার্বিক স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে পৃথকভাবে এখনকার স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা, বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতার হার, গ্রন্থাগার ও তার পাঠক সংখ্যার অবস্থাটিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। তাই এই পরিচ্ছদের উপ-বিভাগ হিসাবে প্রথমেই কোচবিহারের স্ত্রী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান স্বরূপকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

কোচবিহারের স্ত্রীশিক্ষা

কোচবিহারের স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল এখানে যথাযথভাবে স্ত্রীশিক্ষার শুরু হয় ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ কমিশনার কর্ণেল হটন সাহেবের আগমনের পর থেকে। ১৮৬৫ সালে কোচবিহার হিতৈষিণী সভার সহকারী সম্পাদক ও জেনকিন্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কোচবিহার রাজধানীতে একটি স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। রমণীগণ বিদ্যাবতী হইলে আমাদের দেশের বিধিমতে মুখোজ্জ্বল করিবে।' হয়তো বা জনগণের মধ্যে থেকে উঠে আসা দাবির ফলশ্রুতিতেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সময়ান্তরে বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ সালে কোচবিহার জেলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৩ টি, ছাত্রি সংখ্যা ছিল ৫৬০ জন, ১৮৭৯ সালে বালিকা বিদ্যালয় ছিল ৫০ টি, ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৫১ জন এবং ১৮৮১-৮২ সালে বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা উভয়েই হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪ ও ৩৮৩ টি। ১৮৮২ সালে বাংলার অন্য অঞ্চলে ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত ছিল প্রতি ৮৯ জনে ১ জন, সেখানে কোচবিহারে ঐ অনুপাত ছিল প্রতি ১৩০ জনে ১ জন।

নারী শিক্ষার সেই উষালগ্নে ছাত্রীদের কৃতিত্বের পরিমাপ করতে গেলে দেখা যায় ১৮৮১-৮২ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জনই উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ সালে রতিবাবুর বিদ্যালয় থেকে হেমাঙ্গিনী দাসী ও সরলশশী দাসী উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে দিনহাটা বালিকা বিদ্যালয় থেকে পূর্ণপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বর্তমান যুগে এসেও দেখা যায় ৮০-র দশকের পর থেকে কোচবিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৮ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৪৬ ভাগ অধিকার করে রয়েছে ছাত্রীরা। শহরাঞ্চলে মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ স্থানেই সহশিক্ষা প্রচলিত আছে। এরই মাঝে কোচবিহারের ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমানসমান এটা দৃষ্টিগোচর না হয়ে যায় না। (৬)

কোচবিহার রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা ও মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের সহধর্মিণী সুনীতি দেবীর আগমনের পর থেকে। ১৮৮৩ সালে মহারানী সুনীতি দেবী রতিবাবুর বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ করেন ও তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে এটির নাম হয় 'সুনীতি কলেজ' যা পরবর্তীকালে 'সুনীতি একাডেমি' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৮ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

তবে ১৮৭৩ দশকে দিনহাটার বামনহাটের কৃষ্ণকুমার লাহিড়ী ও মেখলিগঞ্জের রাজপুত জোতদার ছত্তরধারী সিং-এর আর্থিক সহায়তায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

উনবিংশ শতকের শেষে কোচবিহারের শিক্ষার চালচিত্র ছিল এইরকম—

মহাবিদ্যালয় —১টি, ইংরেজি বিদ্যালয় — ৪টি, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় — ৩৯টি, পারসিয়ান বিদ্যালয়—৫টি, নৈশ বিদ্যালয়—৪৪টি, বালিকা বিদ্যালয়— ১৫টি, সংস্কৃত টোল—৬টি, পাঠশালা—২৪৫ টি। (৭)

এই সময়ে রাজ্যে শিক্ষিতের হার ছিল প্রতি ১০,০০০ হিন্দু ও মুসলমান পুরুষের মধ্যে বিশক্ষিতের হার ছিল হিন্দু ১০১৬ জন ও মুসলমান ৮৯৩ জন এবং প্রতি ১০,০০০ জন হিন্দু ও মুসলমান নারী প্রতি শিক্ষিতের হার ছিল

হিন্দু ৩১ জন ও মুসলমান ১৯ জন।

সামগ্রিক আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় ১৯৪৯ এ ভারতভুক্তি ও ১৯৫০ এ পশ্চিমবঙ্গভুক্তির পর কোচবিহার জেলায় স্ত্রীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ সালে নারীশিক্ষার হার যেখানে ছিল ১.৭৬ শতাংশ সেখানে ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১ এবং ১৯৮১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৭৮ শতাংশ, ৯শতাংশ, ১১.৯ শতাংশ, ১৯.৯ শতাংশ।

কোচবিহারের স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে কোচবিহারের বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতা কর্মসূচী প্রসঙ্গ। কেননা কোন দেশের সব নাগরিকই নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শংসাপত্র বা ডিগ্রী লাভ করতে পারে না। অথচ নিরক্ষর বা বর্ণপরিচয়হীন নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ ত নয়ই, বরং দায়ভার বললে অতিভাষণ হয় না। মনে রাখা দরকার সাক্ষরতাকে সার্বিক করবার লক্ষ্য নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন সেখানকার ভ্রাম্যমান রোমানি বা বেদে সম্প্রদায়কে সাক্ষর করবার জন্য ভ্রাম্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেছিল। বলা বাহুল্য সার্বিক প্রচেষ্টার সুফল হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা, এমনকি এশিয়ার গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন আজ নিরক্ষরতার ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, বিশেষ করে ভারতে এই অভিশাপ আজও ভয়াবহভাবে বিদ্যমান।

১৯৫১ সালে ভারতে জাতীয় সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৬৭ শতাংশ। নিরক্ষরতার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার ১৯৭৮ সালের ২রা অক্টোবর ১৫-৩৫ বছর বয়স্ক ১০ কোটি মানুষকে সাক্ষর করার প্রকল্প ঘোষণা করেন। সেই সময় এই প্রকল্পের নাম ছিল জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম (ন্যাশনাল এ্যাডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম)। সময়ান্তরে এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে হয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম (Adult Education Programme) ও পরে বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় কার্যক্রম (National Programme for Adult Education). ফলত ঃ ১৯৮১ সালে জাতীয় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬.২৩ শতাংশ। ১৯৮৮ সালের ৫ই মে থেকে কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে এই প্রকল্পের নাম হয় জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন)। জাতীয় লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গের তদানিন্তন ৫টি (বর্তমানে ৬টি) জেলায় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে নতুন জোয়ার আনার জন্য ১৯৮৭ সালের ৩রা আগষ্ট বয়স্ক ও প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৩টি নির্বাচিত কলেজ এই কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল। কোচবিহার জেলার ৩টি নির্বাচিত কলেজ এই কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। পাঠকেন্দ্রগুলি মহিলা ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এর কারণ হল অনেক সময়ই মহিলা শিক্ষার্থীরা পুরুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠগ্রহণ করতে রাজি হত না। দ্বিতীয় কারণ হল পাঠ সামগ্রীগুলি সাধারণ সমস্যা ও আগ্রহের ভিত্তিতে পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই নিরীখে কোচবিহার জেলার সাক্ষরতার সামগ্রিক চিত্রের মূল্যায়ণ সঙ্গত বলে মনে হয়।

কোচবিহার জেলায় ১৫-৩৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষদের জন্য ১৯৮৮-৮৯ সালে ৩০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠিত হয়েছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থান ছিল দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ থানা এলাকায় এবং এগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিল যথাক্রমে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ কলেজ। প্রত্যেক কলেজের অধীনে ১০ টি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সাক্ষরতার চিত্রকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে এখানকার জনসংখ্যা ও জনজাতি সম্পর্কে সম্যক ধারনালাভ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

১৯৮১ এর জনগণনা অনুসারে কোচবিহার জেলার জনসংখ্যাগত চিত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ—

মোট জনসংখ্যা	গ্রাম্য জনসংখ্যা	শহুরে জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট নারী	তপ. জাতি	তপ. উপ. জাতি	শহর
১৭,৭১,৬৪৩	৯৩.১০ শতাংশ	৬.৯০ শতাংশ	৯,১৫,৪৬১	৮,৫৬,১৮২	৮,৮২,৯৮৭	১০,০৯৮	৭

শহরে তপশিলী জাতিভুক্ত জাতির অনুপাত নিম্নরূপ ঃ—

কোচবিহার জেলার শহরাঞ্চলে—১২.৭৫ শতাংশ

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে—১০.০১ শতাংশ

এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সবচেয়ে কম সংখ্যায় বাস করেন — মাথাভাঙ্গায়— ৮.৮৯ শতাংশ

এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বাস করেন — মেখলিগঞ্জে— ৩৪.৮০ শতাংশ

তপশিলী উপজাতি শ্রেণীর লোকেদের ৫১ শতাংশের অধিক বাস করেন মাত্র ৩ টি গ্রামে
কোচবিহারের শহরাঞ্চলে তপশিলী উপজাতি শ্রেণীর বসবাস হল মাত্র ০.৩৬ শতাংশ।
আর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই হার হল ০.৮০ শতাংশ।
এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি সংক্যায় বাস করেন — হলদিবাড়িতে— ২.২৬ শতাংশ
ত'রপরই কোচবিহার সংলগ্ন গুড়িয়াহাটিতে — ০.৪৫ শতাংশ।
১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে কোচবিহারের সাক্ষরতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ—

মোট সাক্ষরতার হার	সাক্ষরতা (পুরুষ)	সাক্ষরতা (নারী)	সাক্ষরতা (গ্রামাঞ্চলে)	সাক্ষরতা (শহরে)	সাক্ষরতা ১০০০এর বেশি জনবসতির গ্রাম	সাক্ষরতা সবচেয়ে বেশি	সাক্ষরতা সবচেয়ে কম
৩০.১০ শতাংশ	৪০.০৯ শতাংশ	১৯.৪৩ শতাংশ	২৭.৪৪ শতাংশ	৬৬.১০ শতাংশ	দিনহাটা ৩১.৭২ শতাংশ	দিনহাটা ৭১.৩৬ শতাংশ	মেখলিগঞ্জ ৫২.৭৩ শতাংশ

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যকালের মেয়াদ ছিল এক বছরের। এই সময় প্রতি ১০টি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ১ জন করে প্রশিক্ষক ও দশটি কেন্দ্রের জন্য একজন করে তত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজার ও সর্বোপরি ১০টি কেন্দ্রের সুপারভাইজারের কাজ তত্বাবধান করার জন্য প্রোগ্রাম অফিসার বা প্রকল্প আধিকারিক হবেন একজন কলেজ অধ্যাপক।

এই কার্যক্রম চলবার পর তিনটি কলেজের অধীন ১০X ৩ = ৩০ টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের পুরুষ মহিলা শিক্ষার্থী নথিভুক্তি ছিল মোট ৯০০ জন, এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ৭২০ ও ১৮০ জন। এর মধ্যে তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্তি পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৫৩২ জন। মাথাভাঙ্গা কলেজের অধীন কেন্দ্রগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলমান শিক্ষার্থী অনেক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সাক্ষরতার উৎসাহ সমাজের বিভিন্ন স্তরকে কতটা তরঙ্গায়িত করেছিল ৩টি কলেজের অধীনে সমবেত সাক্ষরতার শিক্ষার্থীদের পেশাগত পরিচয় সেই চিত্রকে খানিকটা তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

ক্রমিক নং	পেশার নাম	পেশাগত পড়ুয়াদের সংখ্যা				মোট পড়ুয়ার শতকরা হার
		দিনহাটা	তুফানগঞ্জ	মাথাভাঙ্গা	মোট	
১.	কৃষি	১৬১	১০৭	১৩০	৩৯৮	৪৪.২২
২.	কৃষিমজুর	১০১	১২৫	৭৯	৩০৫	৩৩.৯০
৩.	ব্যবসা	১০	২৩	৭	৩৩	৩.৬৬
৪.	রাজমিস্ত্রী	—	০৯	০৭	১৬	১.৭৮
৫.	রিক্সাচালক	০২	—	০৬	০৮	০.৮৯
৬.	ছুতার	২৬	০৬	—	৩২	৩.৫৫
৭.	গৃহকাজ	—	৩০	৬০	৯০	১০.০০
৮.	মৎস্যজীবি	—	—	১৮	১৮	২.০০
	মোট	৩০০	৩০০	৩০০	৯০০	১০০.০০

লক্ষ্যণীয় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষক ও কৃষিমজুর। মহিলাদের অর্ধেক গৃহকর্মের সাথে বাকি অর্ধেক অন্যকর্মের সাথে যুক্ত ছিল। দেখা যায় বেশির ভাগ পড়ুয়াই মধ্যপথে পাঠগ্রহণপর্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ফলে সাক্ষরতার কাঙ্খিত লক্ষ্য পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে না। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একবছরকাল পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে হয়েছিল এমন পড়ুয়ার সংখ্যা ৯০০ জনের মধ্যে ২৬৮ জন।

১৯৯১ এর জনগণনা সূত্র থেকে জানা যায় ঐ সময় মোট ২১,৫৮,১৬৯ জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর ব্যক্তির হার ছিল ৪৫.১০। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য আশানুরূপ অর্জিত না হওয়ায় ১৯৯০ সাল থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও বেসরকারী ভাবে স্বেচ্ছাশ্রমদানের ভিত্তিতে 'সামগ্রিক সাক্ষরতা অভিযান' (টোট্যাল লিটারেসি ক্যাম্পেইন কোচবিহার সেভিং এ্যান্ড্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান মিলালে দেখা যাবে ৩৯,০৫২ কেন্দ্রে ৯-১৪ বছর বয়সী গ্রুপে ৪,৯৭,৬৮৬ ও ১৫-৫০ বছর বয়সী গ্রুপে ৪,৩৯,৪১ জনকে বিদ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১-৪-৯২ থেকে ২-৫-৯২ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটি ব্লকে ও পৌরসভার কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা নেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের ১৮-২০ শে জুন। এই পরীক্ষায় কোচবিহারে ৭১.৯৭ শতাংশ সাক্ষর বলে স্বীকৃত হয়। এর মধ্যে পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতার হার হচ্ছে যথাক্রমে ৭৫.৪০ শতাংশ ও ৬৮.৭৩ শতাংশ। সম্প্রদায় ভিত্তিক, বয়স ভিত্তিক ও পেশা ভিত্তিক সাক্ষরতার প্রাপ্ত চিত্র নিম্নরূপ ঃ—

৯-১৪	১৫-৫০	কৃষক	শ্রমিক	তপশিলী জাতি	তপশিলী উপজাতি	সংখ্যালঘু
৭০.১৬ শতাংশ	৭২.১৮ শতাংশ	৭৫.৭২ শতাংশ	৬৭.৬৪ শতাংশ	৭৩.৭৯ শতাংশ	৭৩.৯৮ শতাংশ	৬৫.৯৫ শতাংশ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা সঙ্গত তিন বিঘা আন্দোলনের জন্য মেখলিগঞ্জে এই কর্মসূচী স্থগিত ছিল।

সাক্ষরতার চূড়ান্ত মূল্যায়ণের পর সমগ্র জেলার প্রাপ্ত সাক্ষরতার চিত্র নিম্নরূপ ঃ—

০-১৪ বছর বয়সী গ্রুপ	১৪-৫০ বছর বয়সী গ্রুপ	মোট
২১,৮৫৮	২,৭৩,৪৬৩	২,৯৫,৩১১

উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমগ্র জেলায় মোট সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা হল ১০,১৭,৮৩৬ এবং এই সংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার ৭৩.৭৭ শতাংশ।

কোচবিহারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কোচবিহার জেলার যে শিক্ষাচিত্র পাওয়া গেল তা সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করবে যদি কোচবিহারের গ্রন্থাগার চিত্র আমরা উদ্‌ঘাটন করি। কেননা প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কোন অঞ্চলের শিক্ষার সার্বিক চিত্র ও মানদন্ডকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে না। কারণ এমন শিক্ষার্থী আছেন যাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্তর বেশিদূর অতিক্রম করেনি, অথচ নিজ প্রচেষ্টায় তাঁরা জ্ঞানতাপস বলা অন্যায় হবে না। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ জীবনের একটা বয়ঃক্রম পর্যন্ত সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষালাভ আমৃত্যু সম্ভব। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অধিকতর পঠনের মাধ্যমে তাঁদের অধীত বিদ্যার অধিকতর মানোন্নয়ন করলেন কিনা সেই চিত্রও কোন অঞ্চলের গ্রন্থাগার ও তার সদস্য সংখ্যার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন এই অঞ্চলের সেই চিত্রকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করবে আশা করা অসঙ্গত হবে না।

কোচবিহার রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অতীতের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, ১৮৭০ সালে রাজকার্যের প্রয়োজনে কোচবিহারে আগত কর্ণেল হটনের উৎসাহে নীলকুঠী অঞ্চলে গড়ে ঠে 'রাজাস লাইব্রেরী' নামে রাজকীয় গ্রন্থাগার। প্রথমদিকে এখানে শুধু ইংরেজি বইই ছিল । দশবছর পর অর্থাৎ ১৮৮০ সালের তথ্য অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারে ৩৯৩ টি বাংলা বই সহ মোট বই ছিল ৬০৮৮টি। প্রথম দিকে রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ ও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা ও পরে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ৫০ টাকার উর্দ্ধ বেতনের উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজকর্মচারীরা এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। ১৮৮৭-৮৮ সালে এই গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক ছিল ৭৫৯২ টি ও বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩০৬১ টাকা ১১ আনা ৬ পাই যা তৎকালীন মূল্যমান বিচারে তুচ্ছ নয় বলা যায়। ১৮৯১ সাল থেকে ৫ টাকা জমা রেখে সদস্যদের নিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৯৫ সালে সাগরদিঘীর পশ্চিম পারে গ্রন্থাগারের নতুন ভবন নির্মাণ হওয়ার পর আট হাজার পুস্তক সমন্বিত গ্রন্থাগারটির নতুন নামকরণ হয় 'কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরী'। এখানে পুস্তক চিত্র ছিল পরবর্তী পৃষ্ঠায় ঃ—

মোট পুস্তক	বাংলা পুস্তক	অন্যান্য ভাষার পুস্তক	সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপি
৮০০০	৫৮৫	৩৪৭	১১৮

১৯১০ সালে কোচবিহারের ব্যবহারজীবিরা এই গ্রন্থাগারের সদস্যপদ লাভ করার সুযোগ পায়। এরপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৯৩৮ সালে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের ইচ্ছা অনুসারে এই গ্রন্থাগারের দরজা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং এটি সাধারণ গ্রন্থাগারের মর্যাদা লাভ করে। ল্যান্সডাউন হল সংলগ্ন এই গ্রন্থাগারে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের প্রশাসনিক বিবরণ, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর পুস্তক ছাড়াও ৯১ টি সংস্কৃত, ২০ টি অসমীয়া ও ১০০ টি বাংলা সহ দুই শতাধিক পাণ্ডুলিপি ছিল যাতে ছিল ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের অনেক অজানা তথ্য। এছাড়া ছিল ২০/২৫ টি পত্রপত্রিকা ও একটি রেডিও সেট যাতে মানুষ বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিত হতে পারে। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কোচবিহারে এসে এখানে রক্ষিত বাংলা পুঁথির একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করেন।

১৯১৬ সালে মহারাজা জীতেন্দ্রনারায়ণ, মহারানী ইন্দিরা দেবী এবং মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি সাধন ও কোচবিহারের ভাষা, সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে মাত্র ৬৯ টি বই নিয়ে কোচবিহার সাহিত্য সভা স্থাপন করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে এখানে ১০,০০০এর মত বই আছে।

১৯১৬ সালে ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ হলদিবাড়ি পরিদর্শনে গেলে তাঁর আগমনের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ সাহিত্য সমিতি ও ক্লাব' নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটি পশ্চিবঙ্গ সরকারের অধীন একটি গ্রন্থাগার। (৮)

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষা কল্পে ১৯৩৮ সালে প্রতিটি মহকুমা শহরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ফলতঃ কোচবিহার রাজ্যের মহকুমা গ্রন্থাগার চিত্র দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ—

প্রতিষ্ঠার বছর	মহকুমা	গ্রন্থাগারের নাম
১৯৩৮	মাথাভাঙ্গা	নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার
১৯৩৮	মেখলিগঞ্জ	নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার
১৯৩৮	দিনহাটা	নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার
১৯৩৮	তুফানগঞ্জ	রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ লাইব্রেরী

ঐ বছর কোচবিহার শহরে ৩টি সহ রাজ্যে মোট উচ্চ বিদ্যালয় ছিল ৭টি ও মহাবিদ্যালয় ছিল ১টি।

এরপর দীর্ঘ উনিশ বছর রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আর নতুন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। এরই মাঝে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগের মত ঘটনার প্রেক্ষিতে সময়ের প্রবাহে কোচবিহারের ভারতভুক্তি ঘটেছে। দেশীয় রাজ্যে কোচবিহার বহু টানাপোড়েনের পর পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তীয় জেলায়।

২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১৯৫৭ সালে কোচবিহারে অন্যান্য জেলার মত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এর এক যুগ পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে কোচবিহার ষ্টেট লাইব্রেরী ও জেলা গ্রন্থাগারকে সংযুক্ত করে গঠিত হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। তবে সত্যের খাতিরে বলতে হয় নাম পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিচিতি লাভ করলেও মর্যাদা বিচারে প্রকৃতপক্ষে এটি জেলা গ্রন্থাগারেরই সমতুল্য।

১৯৭৯ সালে বিধিবদ্ধ হয় ও ১৯৮২ ও ১৯৮৫ তে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের সংশোধনের ফলে এই জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নব মাত্রা সংযোজিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সেই বৃহত্তর আন্দোলনের এক অংশ নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই সময় অর্থাৎ ১৯৭৯-৮৫ সালের মধ্যে জেলার বৃদ্ধি প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

গ্রামীণ গ্রন্থাগার	শহর গ্রন্থাগার	বার্ষিক অনুদান
৬৫	৩	৬০০০০.০০ টাকা (জেলা গ্রন্থাগার) ৩০০০০.০০ টাকা (শহর গ্রন্থাগার) ৫০০০.০০ টাকা (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)

বর্তমানে কোচবিহারের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছোট বা বড় মাপের একটি করে গ্রন্থাগার অবশ্যই থাকে, এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন করে গ্রন্থাগারিকের পদের অনুমোদন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর দিয়ে থাকেন। তবে সেক্ষেত্রে ঐ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ন্যুনতম দুই হাজার পুস্তক থাকা আবশ্যক, তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থাগারিক পদের অনুমোদন দেওয়া হয় না। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষকই গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এছাড়া জেলার দশটি মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন গ্রন্থাগার, এম. জে. এন. হাসপাতাল পাঠাগার, কোচবিহার সাহিত্য সভা, বিবেকানন্দ পাঠাগার ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারগুলি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য পাঠকের জ্ঞান পিপাসা প্রতিনিয়ত চরিতার্থ করে চলেছে।

পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সরকারী উৎসাহবৃদ্ধির ফল হিসাবে ১৯৯১-৯৪ পর্যন্ত কোচবিহারে গ্রন্থাগার ছিল নিম্নরূপ ঃ—

বছর (৩১ শে মার্চ পর্যন্ত)	সরকারী গ্রন্থাগার	অবৈতনিক পাঠক	বিশেষ কেন্দ্র
১৯৯১-৯২	১১১	১১০	১২৮৮
১৯৯২-৯৩	১১০	১১০	১২৮৮
১৯৯৩-৯৪	১১০	১১০	১২৮৮

১৯৭৭ সালে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৬ টি। এই সংখ্যাটি স্মরণে রাখলেই মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্যটা লক্ষ্য করা যায়।

এই অধ্যায়ে সামগ্রিক আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম দেশীয় সামন্ত রাজ্য থেকে জেলা পর্যায়ে রূপান্তরিত কোচবিহারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত কৃতি ছাত্ররা যেমন বৃহত্তর বঙ্গ তথা ভারতের অঙ্গনে আপন প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন, তেমনি শিক্ষার সৌরভ ছড়িয়ে আছে এতদঞ্চলের আপামর মানুষের মননেও। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় একই সঙ্গে আত্মবিকাশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্কৃতি কথাটির আভিধানিক অর্থ যদি হয় সম্যক কৃতি তবে তা কোচবিহারের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সার্থক। এতদঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় এই ঋদ্ধ মননের ছাপ সুস্পষ্ট।

উৎস নির্দেশ

১) শিক্ষার একাল ও সেকাল — কৃষ্ণেন্দু দে— মধুপর্ণী কোচবিহার জেলা সংখ্যা
২) এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টস্ অব কোচবিহার
৩) কোচবিহার ষ্টেট গেজেটিয়ার স্ট্যাটিস্টিক্‌স—১৯০১-০২
৪) সেন্সাস্ রিপোর্ট— ১৯৮১, কোচবিহার
৫) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (কোচবিহার) কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা
৬) কোচবিহারে নারী শিক্ষার বিবর্তন— ড. ছন্দা চক্রবর্তী
৭) নারী শিক্ষা ও কোচবিহার — শুক্লা ঘোষ, সুনীতি একাডেমী শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা
৮) মধুপর্ণী — কোচবিহার জেলা সংখ্যা